দৈনিক সংবাদ

06

তারিখ ... 03 APR 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

সময় বহিয়া যায়

গাছপাথর

অবশেষে শোনা গেলো যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলবে। এমনই পোড়া কপাল আমাদের যে, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় খুলবো কি, চালুগুলোই চলমান রাখতে পারি না। বিশ্ববিদ্যালয় হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে কেবলি মনে হচ্ছিল একে আবার খোলা কারো কর্তব্য কিম্বা দায়িত্ব নয়। সরকার নির্বিকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের বক্তব্য, আগে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হোক তারপরে ভাবা যাবে খোলা যাবে কি যাবে না। দুশ্চিন্তা কেবল বেচারা ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অসহায় অভিভাবকদের। আরো কারো কারো নিশ্চয়ই ছিলো। যাঁরা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবেন, তাঁরাও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন এবং এখনো আছেন। কেননা, প্রশ্নটা কেবল খোলার নয়, খোলা রাখার এবং ভালোভাবে চালানোর। সেই বিশ্ববিদ্যালয় তো কেবল দালানকোঠার সমাহার ও মানুষের ভিড় মাত্র যে বিশ্ববিদ্যালয় নিজেকে নিজে ক্রমাগত অতিক্রম করে যেতে না পারে।

বেচারা ছাত্রছাত্রীরা কি করবে, কেউ কেউ পত্রিকায় চিঠি লিখেছে। বলেছে, স্যাররা কি বোঝেন না, আমাদের কি কষ্ট। যারা মফস্বল থেকে আসে, তাদের প্রথম সমস্যা হয় কোথায় যাবে। তারপরে ভাবতে হয়, অভিভাবকের কাছ থেকে আর কত দিন টাকা আনবে। একজন ছাত্র বলেছে আমাকে "কল্পনা করতে পারবেন না, কত ছাত্র গৃহশিক্ষকতা করে ভরণ-পোষণের অর্থ সংগ্রহ করে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেলে এদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে।" আকাশ ভেঙ্গে পড়ে অভিভাবকদের মাথার ওপরও। শুধু অর্থ সরবরাহের দুর্ভোগটা যে থাকে তা নয়, ছেলেমেয়েদের কি কাজ দেবে, কি দিয়ে ব্যস্ত রাখবে তা বুঝতে না পেরে উতলা হয়। একজন তরুণের জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সময়টা হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান সময়। এ সময়টা নষ্ট করে দিয়ে পরে সে দাঁড়াবে কি করে। মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে খুব করে বলা হচ্ছে, কিন্তু মাদকাসক্তির কারণ তো সৃষ্টি করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ছেলেমেয়েদের কাজ যদি না দেন তবে তারা অকাজতো করবেই। বাধ্য হয়ে। বাংলাদেশের আকাশ দেখা যাচ্ছে বেশ ভঙ্গুর, যেখানে-সেখানে, যখন-তখন ভেঙ্গেপড়ে।

সমাজের অনেক দর্পণ আছে। সে আমরা জানি। একটা দর্পণ যে বিশ্ববিদ্যালয় সেটা খেয়াল করি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল দেখুন, সে প্রাণচঞ্চল নাকি আন্তাবল, খবর নিন, তাহলেই দেশটা কেমন আছে জানতে পারবেন। একাত্তরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রায় মরেই গিয়েছিল, দেশের অবস্থাও ছিলো একই রকমের। এখন দেশ কেমন আছে বোঝার জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্ট কিম্বা প্রতিদিনের সংবাদপত্র না পড়লেও চলে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হালহকিকত দেখলেই নিশ্চিত হওয়া যায়। সব দেখে প্রশ্ন উঠতে পারে, বাংলাদেশ তবে স্বাধীন হলো কেন? সে কি আর সব কিছু বন্ধ করে কেবল অল্প কিছু মানুষের ধনী হওয়ার এবং সারা দেশকে ক্রমাগত নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেবার জন্য? প্রশ্নটা খুব অসঙ্গত নয়।

অভিভাবকদের কথা বলছিলাম। অতিষ্ঠ হয়ে একজন অভিভাবক কি আর করবেন বিশ্বরিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের একজনকে ফোন করেছিলেন। 'কবে খুলবেন বলতে পারেন'? ওপাশ থেকে জবাব, 'জানি না'। 'কে জানে বলতে পারেন'? 'কি করে বলবো'? 'তবে কাকে জিজ্ঞেস করবো'? 'আমি কি জানি'। 'আপনি জানেন না, তবে জানবে কি সেলুনওয়ালা, নাকি লন্ড্রীওয়ালা'? 'কে আপনি?' (রোগতস্বরে)। 'হ্যাঁ, আপনাকে বলি, আর আমার মেয়েটার ক্ষতি করেন।' সংলাপ এখানেই শেষ। কিন্তু তারপর?

বিশ্ববিদ্যালয় কবে খুলবে—এ খবর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন যদি না জানে তবে জানবে কে? দপ্তর খুলে বসে আছেন, অথচ একেবারে প্রাথমিক যে সংবাদ সেটিই জানেন না—এ রূপকথার জগতে সত্য হতে পারে বলে মনে হবে, কিন্তু বাংলাদেশ নামক মানুষের জগতেও তো ঘটছে দেখা যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় তো কোনো পুতুল নয়, যে যখন ইচ্ছা চাবি দিয়ে খুলবেন, কিম্বা যখন ইচ্ছা বন্ধ করবেন, সত্যিকারের বিশ্ববিদ্যালয় কখনো বন্ধ হয় না, এমনকি ছুটির সময়েও নয়, কোন না কোন স্তরে কাজ চলতে থাকে, গবেষণা হয়, প্রকাশনা চলে, জ্ঞান সৃষ্টির কাজ অব্যাহত থাকে। অথচ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যখন তখন বন্ধ হয়ে যায়, তারপর কবে খুলবে খবর নেই, প্রশাসনের কর্তারা ভাবেন, বাঁচা গেলো, সন্ত্রাস তো দমন হয়েছে।

নামছে ; এই প্রক্রিয়ায় দেশ নেমে যাচ্ছে ক্রমাগত। পৃথিবীর কোন্ সভ্য দেশে পাবেন আপনি যে শ্রেষ্ঠ মেধা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না, ভর্তি হয় ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যাল কলেজে? অভিভাবকমাত্রই আশা রাখেন ছেলেমেয়েদের ওই দুই প্রতিষ্ঠানের একটিতে পাঠাবেন। না পারলে তবেই বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছেলেমেয়েরা ভাবে বিদেশে যাবে। আজকাল দেখছি অনার্স থেকে নাম কাটিয়ে বাপ-মা ছেলেমেয়েদের পাস কোর্সে দিচ্ছেন পাঠিয়ে। সেখানে অন্ততঃ সেশন জট নেই, তিন বছরের পড়া শেষ করতে ছয় বছর লাগবে না। সম্মান পরে হবে, আগে পাসতো করুক। এসব মোটেই উন্নতির লক্ষণ নয়, ধ্বংসের পূর্বাভাস বটে।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে কে? বলতে পারবেন, করে সিন্ডিকেট, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান তো। কিন্তু সিন্ডিকেটতো সখ করে বন্ধ করে না, করে বাধ্য হয়ে। বাধ্য করে কে? করে কয়েকজন দুর্বৃত্ত। তারা রাজনৈতিক আচ্ছাদন ব্যবহার করে, কিন্তু তাদের আসল পরিচয় তারা ছাত্র নয়, রাজনৈতিক কর্মীও নয়, আসল পরিচয় খাঁটি দুর্বৃত্ত। সকলেই জানেন ওদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। এই মুষ্টিমেয় কয়েকজনই থেকে থেকে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবনকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং দেশের সামগ্রিক ভবিষ্যতকে বিপন্ন করে। এদের ভয়ে সবাই সন্ত্রস্ত।

এদেরকে নির্মূল করার দায়িত্ব কার? অবশ্যই সরকারের। ডাকাত যদি বসতবাড়ি আক্রমণ করে তাহলে নিশ্চয়ই বলবেন না যে, গৃহস্বামীরই দায়িত্ব পারলে আত্মরক্ষা করা, নইলে পালিয়ে বাঁচা। তবে রাষ্ট্র কেন আছে, কেন সরকার, কেনই বা পুলিশ? চুন্নু যেদিন নিহত হয়, সেদিন কি আভাস পাওয়া যায়নি যে মারাত্মক কিছু ঘটতে পারে? না পেয়ে থাকলে বিভিন্ন গোয়েন্দা বাহিনী কেন রাখা হয়েছে? কি তাদের কাজ? পুলিশ এলো, বিপুল সংখ্যায় এলো, কিন্তু সবই ঘটনার পরে, আগে নয়। আগে এলে দোষ ছিলো কি?

দুর্বৃত্তদের দমন করার দায়িত্ব সরকারের। সিন্ডিকেটের সে সাধ্য নেই। কেউ কেউ ক্যাম্পাস পুলিশের কথা বলেন। কিন্তু সেই পুলিশই বা কি করবে যখন আসল পুলিশ কিছু করছে না? বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চালু রাখার প্রধান পূর্বশর্তই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে অস্ত্রধারীদের শায়েস্তা করা। এ কেবল সরকারই পারে, অন্য কেউ পারে না। সরকারের পক্ষে ওই একেবারে প্রাথমিক দায়িত্বটি এড়ানো কিছুতেই সম্ভব নয়।

দুর্বৃত্তরা রাজনৈতিক দলের আচ্ছাদন ব্যবহার করে। তাই সরকারের পরেই তাদের দায়িত্ব। তাদেরকে প্রকাশ্যে বলতে হবে যে, এইসব গুন্ডারা তাদের লোক নয়। তা না করে উল্টো আশ্রয় দিলে মনে করবার কারণ ঘটবে যে, তারাও চায় না বিশ্ববিদ্যালয় চলুক। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর বিরোধী পক্ষের দু'টি বড় হল পরস্পরকে অভিযুক্ত করেছে। এ বলে ওর দলে গুন্ডা-বদমাসদের আস্তানা ; ও বলে এর। মধ্যবর্তী ছাত্র সংগঠনগুলো বলছে, দুই দলই সমান দোষী। সত্য মনে হয় সেটাই। ওই বড় দুই দল এক সময়ে সরকারে ছিলো, সেই সূত্রে গুন্ডাগুলো হয়তো বা তাদের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার। এই উত্তরাধিকার নিয়ে তারা বড়াই করতে চাইলে করতে পারে, বাধা দেবে কে, কিন্তু ওদিকে উলু খাগড়ার যে প্রাণ যায়। দুই বড় দলবহির্ভূত ছাত্র সংগঠনগুলোর খুব বড় ও ফলপ্রসূ দায়িত্ব পালনের সুযোগ ও আবশ্যকতা রয়ে গেছে। তারা পারে কর্তৃপক্ষের ওপর অব্যাহত চাপ রাখতে বিশ্ববিদ্যালয় যাতে খোলা ও চালু রাখা হয়। দ্বিতীয় কাজ, রাষ্ট্রযন্ত্রকে সচেতন রাখা তার দায়িত্ব সম্পর্কে। তৃতীয়ত, রাজনৈতিক দল দুটিকে বাধ্য করা সন্ত্রাসীদেরকে আশ্রয় না দিতে। তিনটি কাজই অত্যন্ত জরুরী; এক সঙ্গে করা চাই, কোনোটা বাদ দেবার উপায় নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গেই যখন আলোচনা তখন আরো একটা বিষয়ের দিকে তাকানো দরকার। সে হলো শিক্ষকদের ভূমিকা। বলা হয়ে থাকে যে, শিক্ষকরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত, যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গণতান্ত্রিক শাসনবিধি রয়েছে, তদনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে নির্বাচন হয় এবং যেখানে নির্বাচন আছে সেখানে এক ধরনের দলাদলি থাকবেই, সেটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনিবার্য অনুষঙ্গী। তাতে ক্ষতি হয় না? হয়তো হয়। কিন্তু খুবই সামান্য, যে তুলনায় অনেক বড় ক্ষতি হবে যদি বিধি পরিবর্তন করা হয়। আয়ুব-মোনেমের কাল স্মরণ করুন, বুঝতে পারবেন। সে কালে নিয়মিত ক্লাস হতো এটা সত্য, কিন্তু শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি ছিলো না এটা সত্য নয়; শিক্ষককে দৈহিকভাবে আক্রমণের ঘটনা সেকালেই ঘটেছে। বস্তুতঃ ক্যাম্পাসে গুন্ডামি আয়ুব-মোনেমেরই ঐতিহাসিক অবদান, তাই এখন ফুলে ফলে সুশোভিত। পাকিস্তান আমলে সেশন জট ছিলো না এটা সত্য; কিন্তু সে আমলের শিক্ষাই যে আমাদের অনেক দুর্বলতার কারণ তাও অসত্য নয়। সামরিক শাসন শিক্ষার মিত্রপক্ষ